ষষ্ঠ অধ্যায়

বংশানুক্রম ও পরিবেশ

ষষ্ঠ অধ্যায়

বংশানুক্রম ও পরিবেশ

সমাজ ও ব্যক্তি পারস্পরিক-সংশ্লিষ্ট। আমাদের ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশগত ও পরিবেশের গুরুত্ব অপরিসীম। উভয়ের প্রতিক্রিয়ার ফলেই ব্যক্তিসত্তা গড়ে ওঠে। এদের ভূমিকা প্রসঙ্গে Mac Iver & Page বলেছেন " **Heredity.....contains all the potentialities of life, but all its actualities are evoked within and under the conditions of environment.**" (১) জীবনে বংশগতির ও পরিবেশের মধ্যে কার প্রভাব বেশী এ সম্বন্ধে সমাজতত্ত্ববিদগণের মতভেদ রয়েছে। কোন কোন সমাজতত্ত্ববিদ ব্যক্তির উপরে বংশগতির প্রভাবকে গুরুত্ব দেন, আবার কোন কোন সমাজতাত্ত্বিক পরিবেশের প্রভাবকেই সমধিক গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু জীবনে বংশগতি ও পরিবেশ ঠিক যেন জল ও বায়ুর মত। যে কোন একটির অভাবে জীবন বিপন্ন হতে পারে। তাই ব্যক্তিত্ব গঠনে বংশগতি ও পরিবেশ উভয়েরই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু উড্ওয়ার্থ ও মার্কুইস ব্যক্তিত্বকে বংশগত উপাদান ও পরিবেশগত উপাদানের যোগফল না বলে বংশগতি ও পরিবেশের পারস্পরিক ক্রিয়া, প্রতিক্রিয়ার ফলশ্রুতি হিসেবে গণ্য করেছেন। তাঁরা বলেছেন। " **The relation of heredity and environment is not like addition, but more like multiplication. The individual does not equal heredity + environment, but does equal heredity x environment. He is a product of two factors, not a sum of certain parts due to heredity and other parts due to environment.**" (২)

ব্যক্তির জীবনে বংশগতি ও পরিবেশের গুরুত্ব প্রসঙ্গে Mac Iver & Page বলেছেন, "**Heredity is potentiality made actual within an environment. All the qualities of life are in the heredity all the evocation of qualities depends on the environment.**" (৩)

বংশগতি ঃ- শিশু জন্মের সঙ্গে পূর্বপুরুষদের যে সব বৈশিষ্ট্য নিয়ে জন্মায় তাকেই এক কথায় বংশগতি বলে। জীবনের গতি প্রকৃতিতে বংশগতির প্রভাব গুরুত্বপূর্ণ। কার্ল পীয়ারসন বলেছেন— " **The influence of environment is far less than that of heredity in the determination of important human differences. For the people of same race within a given community, heredity is more than seven times more important than environment.**" (৪) জীবমাত্রেরই দেহের গঠন ও মানসিকতা তৈরী হয় তার বংশগতির মাধ্যমে। বংশগতি পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে দুভাবে প্রভাবিত করে। পিতামাতা থেকে প্রাপ্ত যেসব বৈশিষ্ট্য তাকে প্রত্যক্ষ বংশগতি বলে। পূর্বপুরুষদের কাছ থেকে যা পায় তাকে পরোক্ষ বংশগতি বলে। অবশ্য বংশগতি দৈহিক, মানসিক ও জৈবিক এই তিনভাবেই প্রজন্মের উপর প্রভাবিত হয়—যার প্রভাবে ব্যক্তি সামাজিক জীবনে খ্যাতি বা অখ্যাতি পেয়ে থাকে। K. Pearson তাই বলেছেন, "**We are forced, I think literally forced, to the conclusion that the physical and psychological characters in man are inherited within broadlines in the same manner and with the same intensity.**" (৫)

স্ত্রী-পুরুষের মিলনের পর পুরুষের শুক্রকীট ও স্ত্রীর ডিম্বাণু থেকে সৃষ্টি হয় ডিম্বকোষ— যেটি মাতৃজঠরে প্রলম্বিত হয় প্রায় ২৮০ দিন ধরে। প্রতি জনন-কোষের কেন্দ্রাংশে থাকে বংশজ প্রলক্ষণের কতকগুলো বাহক। এদের বলে ক্রোমসোম। এরা সংখ্যায় ২৪টি। স্ত্রী-পুরুষ উভয়ের সমসংখ্যক ক্রোমোসোম থাকে বলে মোট সংখ্যা ২৪+২৪=৪৮টি। প্রতিটি কোষেই ৪৮টি ক্রোমসোম থাকে। সাম্প্রতিক কালে একদল বৈজ্ঞানিক ক্রোমোসোমের সংখ্যা ৪৮ নয়, ৪৬ টি বা ২৩ জোড়া বলেছেন।(৬) এই ক্রোমোসোম বা বংশগতি বাহকগুলো ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র দন্ডের ন্যায় এবং এদের অভ্যন্তরে থাকে অসংখ্য গুটিকা বা দানা—এদের বলা হয় উৎপাদন অণু বা জিন। এই উৎপাদন অণুগুলোই হল বংশগতির প্রকৃত বাহক। "**The most important hereditary determiner is the Gene; Genes are the carrier of information from cell to cell and from one generation to another. They are the unit of inherited material, recognised by their constant effect on the development of any individual bearing them.**" (৭) বিখ্যাত সমাজতাত্ত্বিক Thrope একই কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, "**.....Since, however, each cromosome "thread" is composed of numerous infinitesimal units called Genes, it is more proper as Gilliland suggests, to regard the latter as the real basis of inheritance.**"(৮) "পিতৃকোষের এবং মাতৃকোষের জিনগুলির পারস্পরিক মিলনের উপরেই শিশুর বংশধারার স্বরূপ নির্ভর করে।" (৯) প্রত্যেক শিশুর বংশগতি সম্পূর্ণরূপে তার নিজস্ব সম্পদ। " **The child's heredity is his won unique combination of Genes** "(১০) আবার মাতা-পিতা ও সন্তানের সাদৃশ্যের মত বৈসাদৃশ্যও জিনের উপরেই নির্ভর করে। একই পিতা-মাতার বিভিন্ন সন্তানের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সত্ত্বেও বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব থাকে। তাদের দৈহিক আকৃতি

ও মানসিক বৃত্তি ভিন্ন হয়। এর কারণ একই পিতা-মাতার বিভিন্ন সন্তান ভিন্ন ভিন্ন জননকোষের মিলনে জন্মলাভ করে থাকে এবং এই জনন-কোষগুলোর বংশগতি বাহক বা ক্রোমোসোমগুলো বিভিন্ন। যেমন কোন দীর্ঘাঙ্গ ব্যক্তির কোষগুলোর মধ্যে খর্বতার সম্ভাব্যতা সুপ্তভাবে থাকায় জনন-কোষ গঠনকালে কোন এক সময় খর্বতা বহনকারী ক্রোমোসোম সক্রিয়ভাবে থাকতে পারে এবং সন্তান খর্বাকৃতি হতে পারে। তাই একই পিতামাতার সন্তানের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চতাবিশিষ্ট সন্তান দেখা যায়।

যমজ সন্তানের ক্ষেত্রে বংশগতি বিশেষভাবে প্রভাবিত করে থাকে। যমজ সন্তান দু প্রকার সম-ডিম্বজ এবং দ্বি-ডিম্বজ। সমডিম্বজ যমজের ক্ষেত্রে পুত্র কন্যা দুজনে একই হবে। এই দুই পুত্র বা কন্যার ব্যক্তিত্ব অভিন্ন হয় কারণ দুজনে একই প্রকারের ক্রোমোসোমের অধিকারী। কিন্তু দ্বি-ডিম্বজ যমজের ব্যক্তিত্ব বিভিন্ন ধরণের। পিতৃ-দেহ থেকে আগত দুটি বিভিন্ন জনন-কোষ যদি মাতৃদেহের দুটি ভিন্ন ডিম্বানুতে অল্পবিস্তর একই সময়ে প্রবেশ করে, তাহলে দুই যমজ সন্তানের জন্ম হয়। তাদের কোষের ক্রোমোসোমগুলি ভিন্ন। তাই-তাদের ব্যক্তিত্বের বৈশিষ্ট্যও ভিন্ন প্রকারের হয়ে থাকে।

ব্যক্তি দক্ষতা, পটুতা, কর্মকুশলতা, দৈহিক বৈশিষ্ট্য, রোগ, ঝোঁক ইত্যাদি বংশগতির মাধ্যমেই পেয়ে থাকে। বংশগতির উপর ভিত্তি করেই ব্যক্তির সামাজিক মান-মর্যাদা বা স্তরবিন্যাস হয়ে থাকে। ভারতবর্ষের প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় চতুর্বর্ণ ব্যবস্থা, জাতিভেদ প্রথা বংশগতির প্রভাবেই হয়েছিল। এখনও বিবাহ প্রভৃতি সামাজিক সম্পর্ক স্থাপন করার সময় বংশ, কুল, আভিজাত্য ইত্যাদি বিষয়ের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়ে থাকে। যদিও বর্তমানে এর গুরুত্ব অনেকাংশে অবলুপ্তির পথে— এর কারণ, শিল্পায়ণ, নগরায়ণ, আধুনিকীকরণ ইত্যাদির অভ্যুদয়।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষেত্রেও বংশগতির বিষয়টি কোন কোন সময় গুরুতর সমস্যার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যেমন— মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিগ্রোদের নিয়ে সমস্যা, ভারতবর্ষে উপজাতি সম্পর্কিত ইত্যাদি সমস্যা।

মানুষের সামাজিক বিপ্লবের মূলে আছে বংশগতবিদ্যা বা জিনতত্ত্ব। বংশগতির বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে বংশগত বিদ্যা অনেকাংশে সাহায্য করেছে। প্রকৃতপক্ষে জেনেটিক্স চিকিৎসাশাস্ত্র এক নতুন দিগন্তের সূচনা করেছে। ভবিষ্যতে বংশগতি প্রযুক্তিবিদ্যা (genetic engineering) মানুষের একাধিক সমস্যার সমাধানে হাতিয়ারের কাজও করবে।

পরিবেশ ঃ- পরিবেশ বলতে ব্যক্তিকে যা পরিপূর্ণ ভাবে পরিবেষ্টিত করে আছে তাকেই বুঝি। জীবনে পরিবেশের গুরুত্ব সমধিক। শৈশব থেকে মৃত্যু পর্যন্ত মানুষকে যে সব উদ্দীপক উত্তেজিত করে তার সমবায়ই হল পরিবেশ। শিশুর স্বাভাবিক বৃদ্ধি প্রাপ্তির ও বিকাশ সাধনের প্রক্রিয়ায় স্বীয় দৈহিক অঙ্গ, প্রত্যঙ্গ, সহজাত প্রবৃত্তি, প্রেরণা, প্রেষণা, বুদ্ধ্যঙ্ক প্রভৃতি সবই গৃহের এবং পারিপার্শ্বিক পরিবেশের উপর নির্ভর করে, পরিবেশের গুরুত্ব প্রসঙ্গে, ডঃ শেফার বলেছেন, " **There is..... the strong suggestion that since the change in intellectual structures is most rapid during the child's early life, the early environment encounters are the most important."** (১১) বিখ্যাত আইনস্টাইন যদি আফ্রিকার গভীর জঙ্গলে জন্মগ্রহণ করতেন তাহলে কখনই তিনি বিশ্ববিখ্যাত বিজ্ঞানী হতে পারতেন না। আবার বিখ্যাত চিত্রকর বা সঙ্গীতজ্ঞের সন্তান যদি জীবনে অনুকূল পরিবেশ না পায় তাহলে তাদের প্রকৃত স্ফুরণ সম্ভব হবে না। বংশগতি অপরিবর্তনীয় কিন্তু পরিবেশ পরিবর্তনশীল। অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, **"Human beings are usually capable of passing from one environment to another as well as of changing the conditions of a given environment to suit their won purposes. But they are not on that account more independent of the kind of environment in which they live."**(১২)

পরিবেশগত পার্থক্যের ফলেই মানবসমাজ ও এই সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গের মধ্যে বিভিন্নতা ও বৈচিত্র্য ঘটে। সমাজে বসবাসকারী জনগণের ভাষা, অভ্যাস, রীতি-আচার, নৈতিক চেতনা, জীবন যাত্রার পদ্ধতি ইত্যাদি মানবিক পরিবেশ। ইহা ব্যতীত প্রাকৃতিক ও অন্যান্য পরিবেশ হল বাহ্যিক পরিবেশ। তাই পরিবেশ একক নয় বহু। ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, **"Environment is not one but infinitely various"**। (১৩) বস্তুত: আমাদের বাসস্থানই হল পরিবেশ। এক্ষেত্রে ম্যাকাইভার এবং পেজ বলেছেন, **"Our environment is our habitation in the complete sense."** (১৪) পরিবেশ প্রভাবিত করে সমাজে বসবাসকারী ব্যক্তিবর্গকে আবার পরিবেশও প্রভাবিত হয় ব্যক্তিবর্গের কর্মোদ্যোগের দ্বারা। উদ্ভিদের অঙ্কুরোদগম করার জন্যে যেমন উপযুক্ত জল, বায়ু ও তাপের প্রয়োজন, তেমনি শিশুর জীবন বিকাশের জন্যে উপযুক্ত পরিবেশের প্রয়োজন। যথাযোগ্য পরিবেশের অভাবে শিশুর জীবনের সব সম্ভাবনাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে। কুৎসিত ও কলুষতাযুক্ত সাংস্কৃতিক পরিবেশে যে শিশু প্রতিপালিত হয়, তার মধ্যে দুষ্কর্ম করার প্রবণতা থাকে, তেমনি সুস্থ ও সমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিবেশে বেড়ে ওঠা শিশুর মনোভাব সুস্থ ও স্বাভাবিক হয়।

পরিবেশকে ম্যাকাইভার ও পেজ প্রধানত দুভাগে ভাগ করেছেন, " **In his incessant efforts to modify the conditions of his life, man creates a new type of environment. This man-made environment has a two fold character, an outer and an inner aspect**". (১৫) প্রাকৃতিক পরিবেশের উপর মানুষের বুদ্ধি ও শ্রমনিষ্ঠার প্রয়োগ ঘটিয়ে যে অভিনব আঙ্গিকে প্রকৃতি নিত্য নতুনত্ব লাভ করেছে, বিভিন্ন সুযোগ সুবিধা হয়েছে, জীবন যাত্রার রীতি ও পদ্ধতিতে যে পরিবর্তন সাধিত হচ্ছে : বস্তুতঃ এইসব কিছুর মিলনেই বাহ্যিক পরিবেশের সৃষ্টি হচ্ছে। সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি, প্রথা-প্রতিষ্ঠান, নিয়ম-নিষেধ, সমস্ত রকম প্রবণতা ইত্যাদির সমন্বিত উপস্থিতির মাধ্যমে যে পরিবেশের সৃষ্টি হয় তাই হল সামাজিক পরিবেশ। মানুষের সামগ্রিক পরিবেশ গড়ে ওঠে বাহ্যিক ও সামাজিক উভয় পরিবেশকে কেন্দ্র করেই।

অধ্যাপক জিসবার্টের মতানুসারে পরিবেশ চার প্রকার ঃ—

পরিবেশ

১। প্রাকৃতিক বা ভৌগোলিক।	২। কৃত্রিম	৩। সামাজিক	৪। মনস্তাত্ত্বিক
(জলবায়ু, বৃষ্টিপাত, নদ নদী, পাহাড়, পর্বত, আকাশ, সমুদ্র, সূর্য, নক্ষত্র প্রভৃতি)	(মানুষের তৈরী যে পরিবেশ। যেমন জলসেচ, শিল্প-স্থাপন ইত্যাদি)	(মানুষে মানুষে সম্পর্কের ফলে)	(মানুষের অভিজ্ঞতা অভ্যাস, তার প্রবণতা বা বিশেষ ঝোঁক প্রভৃতি)

এই চার প্রকার পরিবেশের পারস্পরিক যোগ ওতপ্রোত। এদের পৃথকীকরণ প্রায়শই কঠিন হয়ে পড়ে। তিনি নিজেই বলেছেন, " **All these types of environment are so intermixed in their action that at times it is not easy to distinguish one from the other. As to their effects on individuals or society, it is so difficult to find out how far the influence of each of them extends, that the attempt to do it is a perpetual challenge to Sociology and Philosophy.....**"(১৬)

ব্যক্তিত্ব সৃষ্টির ক্ষেত্রে বংশগতি অথবা পরিবেশ এই দুইয়ের মধ্যে কার প্রভাব বেশী? উত্তরে বলা যায় যে, উভয়- এর গুরুত্ব সমান। প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, "বংশগতির মাধ্যমে একটি ভিত্তিভূমি রচিত হয়–উহার মধ্যে বিবিধ প্রলক্ষণের সম্ভাবনা সুপ্তভাবে থাকে। প্রাকৃতিক এবং বিশেষত: সামাজিক পরিবেশের সহিত প্রতিক্রিয়ার ফলে ঐ সব প্রলক্ষণ বিকশিত, পরিবর্ধিত এবং পরিমার্জিত হইয়া থাকে এবং নূতন কিছু কিছু প্রলক্ষণও উহাদের সহিত সাধারণতঃ সংযুক্ত হয়। সমাজের মধ্যে বর্ধিত না হইলে মানব-শিশুর মধ্যে অহংজ্ঞান, নৈতিকতা দক্ষতা, বুদ্ধি, বিবিধ আবেগ প্রকাশের ক্ষমতা ইত্যাদি কোন কিছুই বিকশিত হয় না। মোটকথা, বংশগতি ব্যক্তিত্বের উপাদান সমূহ জোগাইয়া থাকে এবং সুষ্ঠু পরিবেশ উহাদের বিকশিত করিয়া তোলে।" (১৭) অধ্যাপক ম্যাকাইভার ও পেজ ব্যক্তির ব্যক্তিত্ব বিকাশের ক্ষেত্রে বংশগতি ও পরিবেশের গুরুত্ব স্বীকার করে বলেছেন, "**Every phenomenoa of life is the product of both. Each is as necessary to the result as the other. Neither can ever be eliminated and neither can ever be isolated.**" (১৮) জীবন ও পরিবেশ গভীর সম্পর্কে সম্পর্কান্বিত। প্রয়োজনে মানুষ বিভিন্ন স্থানে গমন করলেও সেখানকার পরিবেশের কাছে বাঁধা পড়ে। এক্ষেত্রেও ম্যাকাইভার ও পেজ এর উক্তি প্রণিধানযোগ্য— "**In truth, the relation of life and environment is extremely intimate. The organism itself, the life structure, is the product of past life and past environment. Environment is present from the very begining of life, even in the germ-cells.**"(১৯)

ব্যক্তিত্ব গঠনে শারীরিক গঠন, নার্ভতন্ত্র, এবং গ্রন্থিতন্ত্রের ভূমিকা অনস্বীকার্য। মানুষ কতটুকু সংবেদনশীল তা নির্ভর করে মুখ্যত নার্ভতন্ত্রের উপর। গ্রন্থিতন্ত্র জারিত রস যা হরমোন নামে পরিচিত। হরমোন দেহে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটিয়ে ব্যক্তির উপর প্রভাব বিস্তার করে থাকে। এছাড়া স্বতঃক্রিয় স্নায়ুতন্ত্র যা জন্মসূত্রে প্রাপ্ত। যেটির গতি বৃদ্ধি পেলে মানুষ মানসিক স্থৈর্য হারিয়ে ফেলে বা উৎকণ্ঠাগ্রস্ত হতে পারে। কিন্তু এদের জীবনে উপযুক্ত পরিবেশ থাকলে এর বিপরীত অর্থাৎ সুন্দর ব্যক্তিত্ব গড়ে উঠতে পারে। যদি কোন ব্যক্তির জীবন বেশী মাত্রায় সম্ভাবনাপূর্ণ হয় তবে তার ক্ষেত্রে উপযুক্ত পরিবেশের গুরত্ব অপরিহার্য। উদাহরণ স্বরূপ যদি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়কে জোড়াসাঁকোয় ঠাকুর পরিবারে না রেখে শৈশব থেকে কোন অশিক্ষিত উপজাতি বন্যদের কাছে রাখা যেত তাহলে বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথকে পাওয়া যেত

না। তাই ম্যাকাইভার ও পেজ বলেছেন, **"A new social situation or a happy chance may give a genius the opportunity to reveal his power, but no amount of favourable conjuncture will turn a person of mediocre mentality into a genius. On the other hand, me must not assume, with some protagonists of heredity, that genius will make its way no matter what the environmental impediments may be."** (২০)

তারাশঙ্করের গল্পে বংশানুক্রমিক প্রভাব ঃ-

পূর্বপুরুষদের প্রভাব পরবর্তী প্রজন্মকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করে থাকে। আমাদের চলমান জীবনে এর নিদর্শনের অভাব নেই। তাই জনজীবনে আজও একটি প্রবাদ চলে আসছে "বাপকে বেটা, সিপাই কা ঘোড়া। কুছ্না মেলে তো থোড়া থোড়া।" অর্থাৎ পিতামাতার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ না হলেও কিছু কিছু তাদের সন্তানদের উপর বর্ষিত হয়েই থাকে। তারাশঙ্কর বর্তমান শতাব্দীর মানুষ। এই শতকের প্রথমদিকে বিদেশীদের শাসনে জর্জরিত দেশের অর্থনৈতিক অবস্থা। বিশেষ করে গ্রামবাংলার অবস্থা ছিল অত্যন্ত করুণ। একদিকে ধনতন্ত্রের আবির্ভাব ও পাশ্চাত্যের নির্ভীক আগমন অন্যদিকে ইংরেজ সরকারের নগ্ন আগ্রাসী রাজস্ব আদায়ে ধ্বংসপ্রায় দেশের জমিদারগণ। বংশ পরম্পরায় আর্থিক স্বচ্ছলতার দরুণ জমিদারগণ বিলাসে, বৈভবে ব্যাভিচারী জীবন যাপনে অভ্যস্থ ছিল। নিজেদের আভিজাত্য প্রতিষ্ঠা করতে ও বিপুল অর্থ ও সংগ্রহের জন্য অন্ত্যজ শ্রেণীর থেকে লেঠেল নিয়োগ করতেন। কখনও কখনও নিজেরাও দস্যুবৃত্তিতে নিয়োজিত হতেন। ফলে মদ্যপান, ব্যাভিচারী জীবন পরবর্তী সন্তানদের মধ্যে বর্ষিত হয়। ধনতান্ত্রিক পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থার চাপে সামন্তদের অবস্থা ক্রমশঃ ক্ষীন হয়ে পড়ে। জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান, কৃষিব্যবস্থার প্রতি ইংরেজদের উদাসিকতার ফলে গ্রামে নেমে আসে দুর্দিন। ফলে জমিদারগণ আভিজাত্য, প্রতিপত্তি হারিয়ে ফেলেন। তাঁদের কাজে নিযুক্ত সেইসব নিম্নজ শ্রেণীর লেঠেলরা বৃত্তি হারিয়ে নিদারুণ দারিদ্র্যে পৌঁছায় এবং রক্তে জমিদারীর প্রশ্রয়ে সৃষ্ট চৌর্যবৃত্তির নেশা তাদের দস্যু ও ডাকাতে পরিণত করে। শিক্ষার অভাবে, সুস্থ জীবনের অভাবে, এবং উদ্দাম বন্ধনহীন নিম্নশ্রেণীর জীবন যাত্রা ছিল একেবারে নগ্ন। তাদের কাছে জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ছিল বাধাহীন যৌন প্রবৃত্তির নিবৃত্তি। চরিত্রহীন, কদর্য চরিত্রের জমিদার, তাই তাঁর রাজত্বে সুশৃঙ্খল জীবন যাপন করা প্রজাদের মধ্যে প্রায় অসম্ভব। জমিদারগণই ডাকাত সৃষ্টি করেছেন আবার নিজেদের যৌনাকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করতে নিরীহ প্রজাদের মেয়েদের সর্বনাশ করেছে। এইসব কাজের জন্যে জমিদারগণ গ্রামের শাসন ভেঙ্গে দেন, কিন্তু যখন জমিদারদের অন্তিম পর্যায় নেমে আসে তখন তাঁদের সৃষ্ট অপকীর্তি বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে সমাজের বুকে। পথে পথিকদের চলা দায় হয়। রাতে ভয়ঙ্কর ডাকাতি শুরু হয়। অনাবৃষ্টি বা অতিবৃষ্টির আগমন ঘটে ফলে চাষবাসের অভাবে গ্রামের সমাজজীবন ছন্নছাড়া হয়ে পড়ে। জীবিকার সন্ধানে নানা বৃত্তি গ্রহণ করে যাযাবরের মত ঘুরে বেড়ায়। কেউ ঝুমুর গান, কেউ বাজীকর, কেউ মেলায় মেলায় ঘুরে দেহ পসারিণীর ভূমিকা গ্রহণ করে। এই ছন্নছাড়া, স্বৈরাচারী জীবনের প্রভাব পরবর্তী সন্তানদের মধ্যে বংশগতির প্রভাবে এসে পড়ে। তাছাড়া এই রাঢ় বাংলায় সারা বছরের বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আগন্তুক সম্প্রদায় আসত। যারা বল্গাহীন জীবন যাপনে ছিল অভ্যস্ত। গ্রামে বাউল বা ভিখারীর দল গ্রামের দুর্দশা দেখে শহুরেবাবুদের কাছে বেশী ভিক্ষা পাবার আশায় ভিড় জমায় স্টেশনে। বিংশ শতাব্দীর নগরজীবনের সুস্পষ্ট ছাপ কিন্তু গ্রামে পড়েনি তাই পল্লীজীবনে প্রোথিত ছিল বিভিন্ন ধর্মীয় বেজাল। ধর্মের আবরণে নিজেদের স্বার্থ চরিতার্থ করেছিলেন ব্রাহ্মণ সম্প্রদায়। গায়ে নামাবলী অথচ মনে যৌনক্ষুধা এই প্রবৃত্তি পরবর্তী বংশেও এসেছিল অনিবার্য হিসেবে। কোন জমিদার নিজের স্ত্রীকে হত্যা করে এবং পরবর্তী বংশধরের মধ্যে এই নরঘাতী নেশা পেয়ে বসে। মধ্যবিত্তদের মধ্যে শিক্ষা প্রসার ঘটে বেশী। শিক্ষিত হয়ে তারা বিবাহ প্রভৃতি অনুষ্ঠানের সমগোত্রীয় বন্ধন শিথিল করে। উচ্চবর্ণের ছেলেমেয়েরা নিম্নবর্ণের ছেলেমেয়েদের প্রেম ও ভালবাসায় বিয়ে করতে থাকে। জীবিকার প্রয়োজনে যাযাবর বেদে সম্প্রদায় স্থায়ীভাবে বসবাস করেছে কিন্তু তাদের রক্ত থেকে যৌনাকাঙ্ক্ষা নিবৃত্তি হয়নি, বিশেষ করে মেয়েরা পরম্পরায় স্বৈরিণী থেকে গেছে।

তারাশঙ্কর মূলতঃ রাঢ় বাংলার কথাকোবিদ। বাস্তবতার অঞ্জনে তাঁর সাহিত্যের যাত্রা শুরু। তাঁর অসংখ্য গল্পের মধ্যে বংশগতির প্রভাব স্পষ্ট। গ্রামবাংলায় শিক্ষার প্রসার বা শহরের ঝলসানি দ্রুত প্রসার হয় নি, ফলে জীবন যাত্রা ছিল একই মানের নদীর স্রোতের মত। তাই এখানে বংশগতির প্রভাব সমাজ জীবনে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করেছিল। তারাশঙ্করের বিভিন্ন গল্পে এর উদাহরণ মেলে।

খড়্গ ঃ- বাংলাদেশের ঢাকার এক বিখ্যাত রাজবংশের রামজীবন রায়। ঔরঙ্গজেবের আমলে বাংলার নবাব মুর্শিদকুলী খাঁর সঙ্গে সংঘর্ষে রায়বংশের পতন হয়েছিল। সেই বংশেরই এক শাখা বর্তমানে গল্পের বিষয়বস্তু। রাজ্য নেই, সৈন্য, সম্পদ, প্রতিপত্তি কিছুই নেই তথাপি গ্রামবাসীর কাছে রায়বংশের বর্তমান বংশধর "রাজাবাবু" বলে সম্বোধন পান। রাজাবাবু শিক্ষিত—ওকালতি করেন। জমিদারী না থাকলেও জমিদারী রক্ত বর্তমান। রায়বংশের পতনের জন্যে তিনি হাহুতাশ করেছেন। বংশের ঐতিহ্য সিংহবাহিনীর মন্দিরে বলির জন্যে কালদন্ড নামে খড়্গখানি রামজীবন রায়ের আমলেই

ভেঙে যায়। সেটিকে মেরামতির জন্য তিনি উদগ্রীব হয়েছেন। রাজাবাবুর রাজ্য না থাকলেও প্রাক্তন রাজত্বের দাপট ও দম্ভ ক্রিয়াশীল থেকেছে। এই গল্পে এক কামারের ছেলে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেও চাকরী পায় নি— পিতৃপুরুষের লোহার কাজই সে করেছে। তার জীবনে বহু আশা ছিল, সে স্বপ্ন দেখেছিল অনেক, কিন্তু কোন স্বপ্নই তার সার্থক হয় নি।

রাজাব্রাণী প্রজা ঃ- রাঢ় বাংলার পল্লীগ্রামের ক্ষয়িষ্ণু সামন্তদের চিত্র। এই গল্পটি লেখকের নিজের জীবন-কাহিনী। তাঁর পূর্বপুরুষগণ ছিলেন দাম্ভিক, অত্যাচারী, প্রবল প্রতাপান্বিত। দাপটের সঙ্গে জমিদারী শাসন করেছিলেন। বর্তমান জমিদার সামান্য জমিদারীর মালিক। নিরীহ, শান্ত প্রকৃতির মানুষ; তথাপি সরকারী খাজনা দাখিলের চাপে পড়ে খাজনা অনাদায়ী প্রজাদের উপর নির্যাতন করতে উদ্যত হয়েছেন— হাতে বন্দুক তুলেছেন। এতো বংশগতিরই প্রভাব। তারাশঙ্কর মানবতাবাদী, দেশ সেবক হয়েও প্রজাপীড়নে উদ্যত হয়েছেন। আবার সনাতন ভারতের নারী হৃদয় সর্বদাই যে কোমলা ও শান্তিপ্রিয়া রাণীমার মধ্যে সেই ধারা ক্রিয়াশীল থেকেছে। বিদ্রোহী প্রজা রাইবল্লভের স্ত্রী-পুত্র আশ্রয় চাইলে রাণীমা তাদের আশ্রয় দিয়েছেন। অন্যদিকে জমিদারের কাজে নিযুক্ত গোমস্তাগণ বংশ পরম্পরায় শঠ, প্রবঞ্চক ছিলেন। তার বহু নজির বিভিন্ন স্থানে পাওয়া যায়। গোমস্তাদের কুচক্রী মনোভাবের দরুন বহু জমিদার যেমন অযথা অত্যাচারী হয়েছেন আবার জমিদারীরও অকল্পনীয় ক্ষতি হয়েছে। গোমস্তাদের চরিত্র যেন বাজীকরের মত। গোমস্তার জন্যই এই গল্পে জমিদার যেমন উত্তেজিত হয়েছেন, তেমনি "রায়বাড়ি" গল্পেও রাবণেশ্বর রায় গোমস্তা-হত্যার দায়ে ছত্রিশ মৌজা ধ্বংস করেছেন। গোমস্তাকে নিরীহ প্রজারা নিশ্চয়ই বিনা দোষে হত্যা করেন নি। এভাবে পুরুষানুক্রমে গোমস্তা, নায়েব প্রভৃতি সুবিধাভোগী, কুচক্রী কর্মচারীতে পরিণত হয়েছিল।

বিষধর ঃ- ক্ষয়িষ্ণু জমিদারদের শোষণ, অত্যাচার ভোগতৃষ্ণার অজস্র নিদর্শন তারাশঙ্করের অসংখ্য গল্পে বিদ্যমান। জমিদারী-দাপট ও দম্ভ এবং প্রজাদের দারিদ্র্যের সুযোগ নিয়ে অনেক জমিদার বহু পুরুষ ও নারীর সর্বনাশ করেছেন। বিনয়কৃষ্ণ রায় জমিদারীর সাত আনির এক আনির অর্ধেক মালিকের তৃতীয় পুত্র। সরকারী চাকুরে। শহরের প্রগতিশীল জীবনের সংস্পর্শে এসেছে কিন্তু পূর্বপুরুষজাত জমিদারী রক্তকে অস্বীকার করতে পারেন নি। বর্তমানে অবসর প্রাপ্ত। গ্রামে বিভিন্ন মজলিসে বসে কেবল বড় বড় প্রগতির বুলি আওড়ান, গ্রামের ছেলেমেয়েদের সমালোচনা করেন। বৃদ্ধ আশী বছরের সাধুর চরিত্র নিয়েও সন্দেহ প্রকাশ করেন, নির্বিষ সাপের মত গর্জন করে নিজেকে সমাজপতি বলে জাহির করেন। তিনি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে দরখাস্ত পাঠাবার ব্যবস্থা করেন যাতে গ্রামে নলিনীশের মেয়ে যুবতী বিরাজ এই সাধুকে বাড়ীতে না রাখতে পারে। অথচ এই বিনয়কৃষ্ণ রায় পাড়ার গোষ্ঠবিহারী রায়ের স্ত্রীকে সন্তানসহ প্রলুব্ধ করে ঘর থেকে নিয়ে কলকাতায় পালান। সেখানে তিনি তাকে ভোগ করে ত্যাগ করেন। নিরীহ স্ত্রীলোকটির প্রতি বা সন্তানটির জন্যে সামান্য কর্তব্যও করেন নি; পূর্বপুরুষদের ব্যাভিচারিতার প্রত্যক্ষ প্রভাব বিদ্যমান থেকেছে।

জলসাঘর ঃ- বিশাল জমিদারী, প্রচুর সম্পদের অহংকারে অমিতব্যয়ী ও অমিতাচারী জীবনযাপনের জন্যে চার পুরুষের অর্জিত সম্পদ ৫ম, ৬ষ্ঠ এবং সপ্তম পুরুষ বিশ্বম্ভরের আমলে এসে নিঃশেষ হয়ে যায়। শুধু থাকে প্রাচীন ঐতিহ্য, মৃতপুরীর ন্যায় জীর্ণ প্রসাদ। তারই এক কোণে নির্জনে দিন যাপন করেন বিশ্বম্ভর রায়। শুধু অতীত স্মৃতির রোমন্থন করেন। তবু এই ম্রিয়মান, শোকে মুহ্যমান বিশ্বম্ভরের ব্যক্তিত্ব সদ্য উদীয়মান ঐতিহ্যহীন ধনী মহিম গাঙ্গলীর উপর টেক্কা দিতে গর্জে উঠেছে। শেষ সম্বলটুকু জলসাঘরে খরচ করতে দ্বিধা করেন নি। বস্তুতঃ ভালো হয়ে থাকতে চাইলেও পিতৃ পুরুষের উষ্ণ রক্ত তাঁর শরীরে শিহরণ জাগিয়েছে। তাই উদীয়মান ধনতন্ত্রের কাছে নিশ্চিত পরাজিত জেনেও অসম প্রতিযোগিতায় এগিয়ে এসেছেন। আবার সারারাত আকণ্ঠ মদ্যপান করে ভোর বেলায় বেসামাল অবস্থায় ঘোড়ায় চড়ে ঘূর্ণি ঝড়ের মতো ছুটে যান। সম্বিত ফিরলে শূন্য জলসাঘরে ফিরে আসেন এবং জলসাঘরের দরজার সামনে পড়ে যান ও জ্ঞান হারান। এই প্রৌঢ় বয়সে এমন অবস্থা— এতো পূর্বপুরুষদের কাছ থেকেই তো তিনি পেয়েছেন।

তিনশূন্য ঃ- সন্তান একপ্রকার সম্পদ। এ হল মানব সম্পদ। এর সুন্দর ও স্বাভাবিকতার জন্য উৎপাদন কালে যত্ন নিতে হয়, যেমন পল্লীর কৃষকবৃন্দ বহু পরিশ্রম ও নিষ্ঠার মাধ্যমে শস্য উৎপাদন করে থাকেন। অযত্নে, শস্য লাগালে তার ফসল সুন্দর ও পুষ্ট হয় না, অনেকাংশই নষ্ট হয়ে যায়, ঠিক তেমনি মানব সম্পদ সৃষ্টির ক্ষেত্রেও তাই। দুর্ভিক্ষের অন্তরালে একদল কামুক পশুস্তরের সম্ভ্রান্ত বংশীয় জীব খুঁজে বেড়ায় তাদের রিরংসার সামগ্রী দরিদ্র যুবতীদের। অসহায়া মেয়েদের নির্জনে পেয়ে সামান্য অর্থ ও খাবারের ঠোঙা দিয়ে মিটিয়ে নেয় তাদের দেহের ক্ষুধা। তাদের বিকৃত রুচির রক্তের ফসল বয়ে বেড়ায় সেই মেয়েরা। পরে জন্ম দেয় পঙ্গু পশু মানবের। শারীরিক গঠনে অক্ষম হলেও পশু-পিতার রক্ত থেকে পাওয়া দেহজ ক্ষুধা থাকে প্রবল। তাই দেখা যায় চৌদ্দ পনেরো বছর বয়সে খাবারের সন্ধান করতে করতে নর্দমা, আস্তাকুড় ঠেলে গৃহস্থের ঘরে ঢোকে ল্যালা। ঘরে দেখে নিশ্চিন্তে গভীর নিদ্রায় মগ্ন এক কিশোরী— তার সর্বাঙ্গের আবরণ শিথিল হয়ে গেছে। সেই দৃশ্য দেখে বিকৃত বিধাতার অবাঞ্ছিত সৃষ্টি ল্যালা ঝাঁপিয়ে পড়ে সেই কিশোরীর সর্বনাশ করে তার জন্মদাতাদের মতই তার আদিম ক্ষুধা মেটায়। জন্মদাতাদের মত সেও নিষ্পাপ কিশোরীর সর্বনাশ করে।

পরিবেশ-অনুকূলের জন্যে বংশানুক্রমিক দোষ এখানে সহজেই প্রকাশ পেয়েছে। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ সেন তাই বলেছেন, "পরিবেশ অনুকূল হইলে বংশানুক্রমিক দোষ-গুণগুলি সত্বর এবং সহজেই বিকাশ লাভ করে।" (২১)

সন্তান ঃ- এই গল্পের নায়ক গোবিন্দ প্রকৃতির বিকৃত মনোবিলাসের সৃষ্টি। উদরে থাকাকালীন তার মা বিষপান করেছিল, ফলে বিষের ক্রূর সর্পিল গতিচিহ্ন গোবিন্দ স্থায়ীভাবে লাভ করে, সে হয় বিকৃত ও বিকলাঙ্গ। শান্ত ও সরল গোবিন্দ বিয়ে করলেও কিছুদিনের মধ্যেই পালিয়ে যায়। সে দ্বিতীয়বার বিয়ে করার জন্যে চেষ্টা করে কিন্তু অর্থাভাবে হয়নি। তাই অর্থের জন্যে স্থানীয় জমিদার লক্ষ্মীবাবুর বাড়ীতে চাকর বৃত্তি গ্রহণ করে। জমিদারবাবুর শিশু পুত্রকে সে অত্যন্ত ভালোবেসে ফেলে এবং শিশুটির কাছে নিজে বাবা সাজতে চায়। এই সংবাদে জমিদার তাকে চাকুরী থেকে তাড়িয়ে দেন। গোবিন্দর মনে তখন জমিদার তনয় 'মানিক' জুড়ে বসে। তাই সে বিয়ের জন্যে জাত খুইয়ে নিকুঞ্জ বৈষ্ণবের বাল-বিধবা কন্যা মঞ্জুরীকে বিয়ে করে। এরপর বাপের বাড়িতে মঞ্জুরী এক বিকৃত বীভৎস অবিকল গোবিন্দর মতো সন্তানের জন্ম দেয়। গোবিন্দ নিজের সন্তানকে নিজেই হত্যা করে এবং শেষে পাগল হয়ে যায়।

এমনই আর একটি গল্প "মতিলাল"। নিজে কুৎসিত, বিকলাঙ্গ বলে সমাজের কাছে ঘৃনিত, অপমানিত ও লাঞ্ছিত হয়েছে। তাই তার হৃদয় থেকে সন্তান-কামনা মুছে গেছে। ধিক্কারে সে নিজের স্ত্রীর হাত থেকে মাদুলী খুলে দিয়ে বলে, "আমাদের ছেলে আমাদেরই মতো কুচ্ছিত হবে তো ভোবন! কাজ নাই।" বর্তমান দুই গল্পে বংশগতি একজনকে করেছে পুত্রঘাতী; অন্যজনকে নিঃসন্তান হবার প্রেরণা জুগিয়েছে। আবার "শাপমোচন" গল্পে দেবীচরণ শিক্ষিত হয়েও কুৎসিত রূপের জন্যে চাকরী পায় না, সুন্দরী স্ত্রীর ভালবাসা পায় না— ফলে সে আত্মহত্যা করেছে।

ফল্গু ঃ- জমিদারগণ-বংশ পরম্পরায় অত্যাচারী, নরঘাতী ছিলেন। এই প্রবৃত্তি পরবর্তী বংশধর বয়ে নিয়ে বেড়ায়। ফলে বহু জমিদার বংশ ধ্বংস হয়ে যায়। এই গল্পে মহাবিষ্ণু সরকার প্রথমা স্ত্রীকে সন্দেহের বশে গলাটিপে হত্যা করেন। এই জান্তব রক্তের সৃষ্টি আরও ভয়ংকর। তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র ধীরেশ প্রজাকে গুলিবিদ্ধ করে আন্দামানে দ্বীপান্তরে গেছে। যৌবন বয়সের অত্যাচার ও অনিয়মের ফলে মহাবিষ্ণুর বৃদ্ধ বয়সে কুষ্ঠ হয়। পিতার রক্তের উগ্রতা ধীরেশকে প্রজাহত্যায় প্রেরণা দিয়েছে।

বেদের মেয়ে ঃ- বেদের মেয়ে শিবি। তিন পুরুষধরে সে স্থায়ীভাবে সমাজে বসবাস করছে, ফলে প্রেমের মাধুর্য সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। আবার পূর্ব পুরুষদের কাছে থেকে পেয়ে চৌর্যবৃত্তি এবং অরুগ্ন বলিষ্ঠ হিংস্র নগ্নবর্বরতা। এই দ্বিবিধ সত্তা শিবি চরিত্রে ক্রিয়াশীল। শিবি ভদ্রসমাজের প্রভাতকে অন্তরদিয়ে ভালবাসতে চেয়েও না পাওয়ার বেদনায় সে হিংস্র হয়ে উঠেছে আবার ভোলা-চোরকে বিয়ে করে তাকে হৃদয় দিয়ে ভালবাসতে চেয়েছে। প্রভাতের জন্যে যখন ভোলার ক্ষতির সম্ভাবনা দেখা দেয় তখন শিবি প্রভাতকেই হত্যা করেছে।

দীপার প্রেম ঃ- দীপা উচ্চবর্ণে জন্মে ও এম. এ পাশ করে তাদেরই পূর্বতন পরিচারিকার নাতি দেবপ্রিয় হালদারকে বিয়ে করে। দেবপ্রিয়রা কাওড়া যুগী। দীপার জীবনে এই পরিণতির জন্যে কাদের প্রভাব পড়েছে তার প্রত্যক্ষ কোন কারণের উল্লেখ নেই। তবে তার দাদু অধ্যাপক ছিলেন। তাঁর পুত্র (দীপার বাবা) অল্প বয়সে মারা গেছেন কিন্তু মারা যাবার কোন কারণের উল্লেখ নেই। আবার দীপার মা শোভা অনেক বয়সে দীক্ষা নিয়ে গুরুর কাছেই থেকে যায়, এ নিয়ে অনেকেই কটাক্ষ করে। এর থেকে আমাদের মনে হওয়া সঙ্গত যে দীপার মায়ের পূর্বপুরুষদের হয়তো এমন চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য ছিল যার প্রভাব দীপার মায়ের জীবনে প্রৌঢ়-বয়সে এসেছে আবার দীপার জীবনে মায়ের প্রভাব কুমারী জীবনেই পড়েছে।

আখড়াইয়ের দীঘি ঃ- বহু প্রাচীন কাল থেকেই বাংলাদেশে ডাকাতির ঘটনা ঘটত। অর্থের লোভে বা প্রভাব প্রতিপত্তি রক্ষার জন্য এবং নিজ জমিদারীর নিরাপত্তা অটুট রাখার জন্যে এ দেশে জমিদাররা নিজেরাও চুরি-ডাকাতিতে অংশ নিতেন, আবার সমাজের নিম্ন শ্রেণী যেমন ডোম, বাগদী প্রভৃতিদের মধ্যে থেকে শক্তিশালী পুরুষদের সংগ্রহ করতেন। এরা প্রয়োজনে লাঠিয়াল সাজত, আবার রাতের অন্ধকারে জমিদারের ডাকাতিতে সহযোগী হত। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে হুগলী, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম এবং যশোহর জেলায় ডাকাতির যে ঘটনা ঘটেছিল তার একটি বিবরণ দেখা যেতে পারে— (২২)

	খ্রীঃ ১৮৪৬	১৮৫৭	১৮৫৮	১৮৬০
হুগলী	৪১	৩০	২৭	২৫
মুর্শিদাবাদ	৬৫	৫০	২৯	২৫
বীরভূম	৩১	১৯	৫১	৩৩
যশোহর	৬২	-	-	-

এখানে ১৮৪৬ সালের তুলনায় ১৮৬০ সালে ডাকাতির সংখ্যা ক্রমশ কম ছিল, কারণ ১৮৫৮ সালে ইংরেজ সরকার ডাকাতি দমনের জন্যে পুলিশের ডাকাতিদমন বিভাগ খোলেন। দারোগা গ্রামে গঞ্জে ঘুরে সন্দেহযুক্ত ব্যক্তিদের গ্রেপ্তার করে চালান দিত। ফলে ডাকাতির দৌরাত্ম্য একটু কমে ছিল। জমিদারদের নিজ এলাকায় কিছু লাঠিয়াল ও ডাকাত ছিল। জমিদার অবাধ্য প্রজাদের বা অন্য জমিদারদের শায়েস্তার জন্যে অর্থ বা জায়গা দিয়ে এদের পুষত। এইভাবে দীর্ঘদিন থাকার ফলে তারা চাষ বাস ভুলে যায়, কেবল লাঠি আর শক্তির দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। কালক্রমে জমিদারীর পতন শুরু হলে তারা বাধ্য হয়ে ঠ্যাঙাড়ে বা ডাকাতে পরিণত হয়েছে। এরা মদ ও ভাঙ খেত। নেশার ঘোরে এরা অমানুষ বনে যেত। ডাকাতি করতে গিয়ে কত ভয়ঙ্কর ও নিষ্ঠুর কাজও তারা করত। তারাশঙ্কর "আমার কালের কথা" য় বলেছেন, "মানুষকে খুঁটিতে বেঁধে উনান জেলে কড়া চড়িয়ে তেল গরম করে সেই তেল গায়ে ঢেলে দিত। কত সময় মানুষকে বেঁধে সেই তপ্ত কড়ায় বসিয়ে দিত। জ্বলন্ত মশাল দিয়ে পিটত। মানুষের গলা আধখানা বা দু-ফাঁক করে দিয়ে যেত। শড়কিতে গেঁথে এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিত।"[২৩] বর্তমান শতাব্দীর সূচনাপূর্বে বীরভূম-মুর্শিদাবাদে প্রায়ই যে ডাকাতি হত তা ছিল যেমন ভয়ঙ্কর, তেমনি নৃশংস। লেখক নিজেই বলেছেন, "কত রাত্রি বাল্যকালে বিনিদ্র কাটিয়েছি তার হিসাব নাই। মধ্যে মধ্যে এক একটা সময় আসত, যখন দু-তিন মাসের মধ্যে তিনচার ক্রোশের ভিতর চার-পাঁচটা ডাকাতি হয়ে যেত" [২৪] লাভপুরের দক্ষিণে সিউড়ি থেকে কাটোয়া যাবার পথে পাকা সড়কে রাতের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকত মৃত্যুদূতের মত "মানুষুড়ে" বা ঠ্যাঙাড়ে। বামনিগ্রাম (মুসলমান অধ্যুষিত), ধনডাঙ্গা (হিন্দু অধ্যুষিত) গ্রামগুলি ছিল ঠ্যাঙাড়ে প্রধান গ্রাম। মুসলমান প্রধান গ্রাম বজরহাটেও ছিল। লেখক একবার সাঁইথিয়া যাবার সময় এদের হাতে পড়েন কিন্তু ভাগ্যচক্রে বেঁচে যান। ঠ্যাঙাড়েরা বড় নিষ্ঠুর— সামান্য দু চার পয়সা ও পরনের কাপড়টার জন্যে তারা অনায়াসে মানুষ খুন করত এবং আখড়াইয়ের দীঘির মাটিতে পুঁতে দিত। পথে চলন্ত পথিককে লক্ষ্য করে পায়ে পাবড়া ছুঁড়ে মারত। পথিক রাস্তায় পড়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে দস্যুরা এসে পথিকের ঘাড়ে বড় লাঠি দিয়ে লাঠির দু প্রান্ত দুজনে চেপে ধরত, অন্যজন মানুষটাকে উল্টে দিত আর মট করে ঘাড়ের মেরুদন্ডটা ভেঙে যেত। দাশকল গ্রামে একরাত্রে পথিক ভেবে নিজ পুত্রকে হত্যা করেছিল এক ঠ্যাঙাড়ে। এই ঘটনার উপরেই লেখা "আখড়াইয়ের দীঘি"।

কয়েক পুরুষ নবাবের পল্টনে কাজ করেছে, পরে কাজ চলে যায় কিন্তু লাঠি ছাড়তে পারে না। মদ খেয়ে লাঠি নিয়ে পুরুষ পরম্পরায় ঠ্যাঙাড়ে সাজে। গল্পের নায়ক কালী বাগদী নিজেই বলেছে, "কোম্পানীর আমলে পল্টনের কাজ যখন গেল, তখন থেকেই এই আমাদের ব্যবসা। হুজুর চাষ আমাদের ঘেন্নার কাজ, মাটির সঙ্গে কারবার করলে মানুষ মাটির মতই হয়ে যায়। মাটি হল মেয়ের জাত।" কালী নিজে আরও স্বীকার করেছে যে, তারা চারপুরুষ ধরে এই মানুষ মারার কাজ করছে। কালী রাত্রে পথিক ভেবে নিজ ঠ্যাঙাড়ে-পুত্র তারাচরণকে হত্যা করেছে। বিষাক্ত রক্তের কী ভয়াবহ পরিণতি। মরার সময় তারাচরণ বলেছে, " বাবা বাবা আমি,"। ঘাড় মটকিয়ে কালী বলেছে, " এ সময়ে বাবা সবাই বলে।" নিজপুত্রকে হত্যা করে মাত্র ছ'আনা পয়সা ও পরণের কাপড়টা পেয়েছিল সে।

বংশপরম্পরায় ডাকাতির চিত্র পাওয়া যায় "প্রহ্লাদের কালী, চোরের মা, চোর" প্রভৃতি গল্পে।

প্রহ্লাদের কালী ঃ- প্রহ্লাদ ভল্লা। এটি বাগদীদেরই একটি শাখা। তার বাবা অক্ষয় ভল্লা দুর্ধর্ষ লাঠিয়াল ও দাঙ্গাবাজ। তার পুত্র প্রহ্লাদও বাবার রক্ত নিয়ে জন্মে আরও জঘণ্য কাজ করেছে। এমন কোন পাপ নেই যে সে করেনি। প্রহ্লাদ তিনটি বিয়েও করেছিল এবং অন্য তিনজনকে নিয়ে রঙের খেলা খেলেছে। ছেলেমেয়েদের প্রতি সামান্য কর্তব্যও সে করেনি। প্রহ্লাদ ছিল নৃশংস, মনুষ্যত্বহীন, নরকের কীট। এর জন্যে দায়ী তার বাবা এবং বংশের ধারা।

চোরের মা ঃ- এই গল্পের শুরুতেই লেখক নিজেই বলেছেন— "চুরির নেশা এই ডোম বংশটির রক্তের কণায় কণায় যেন জলের সঙ্গে মহামারীর বীজাণুর মত মিশিয়া আছে। আর তাহা পুরুষে পুরুষে বাড়িয়া চলিয়াছে। কয়েক পুরুষ ধরিয়াই পুত্র-পৌত্রাদিক্রমে এই ব্যবসায় তাহারা নিয়মিত ভাবে করিয়া আসিতেছে।" [২৫] তাই পিতৃহারা সন্তান ফিঙে আঠার-উনিশ বছরের মধ্যেই মায়ের শত অনুরোধ উপেক্ষা করে চুরি করতে গেছে এবং ধরা পড়েছে। শেষে জনতার প্রহারে মারা গেছে।

চোর ঃ- এই গল্পের ধান-চোর শশীর বংশানুক্রমিক চোরের বংশ। তিনপুরুষধরে তাদের রক্তে চৌর্যব্যাধির বীজাণু রয়েছে। শশী বাতে পঙ্গু, তথাপি বংশানুক্রমিক বহুপত্নীক ছিল। তার ছেলে হাবলেরও এক স্ত্রী ও এক উপপত্নী ছিল।

আইন অমান্য আন্দোলনে তারাশঙ্কর যোগ দিয়ে জেলে যান। জেলের মধ্যে আলাপ হয় বিখ্যাত ডাকাত কালী বাগদীর সাথে। জেলখানার অন্ধকার পাষাণপুরীতে অসংখ্য অপরাধ-প্রবণ মানুষের সংস্পর্শে তিনি আসেন। পরে তারাশঙ্কর "পাষাণপুরী" উপন্যাসখানি এদেরই জীবনের উপরে রচনা করেন। (২৬)

মধুমাস্টার ঃ- এই গল্পে বংশগতির ছাপ স্পষ্ট। দরিদ্র শিক্ষক মধুমাস্টার দেশের ও শিশুদের মঙ্গলের জন্যে সুন্দর একটি ইংরেজী বই লিখতে শুরু করেন। প্রথম পর্বে জমিদার জ্ঞানদাবাবু সাহায্য করলেও শেষে সাহায্য না পেয়ে অসীম কষ্ট করে বইখানি অসমাপ্ত রেখেই মারা যান। তাঁর উপযুক্ত পুত্র অরুণ কৃতি-ছাত্র হয়ে বাবার অসমাপ্ত বইটি সম্পূর্ণ করেন। পিতার লেখার ঝোঁক পরবর্তী পুত্রের মধ্যে বর্তেছে।

পরিবেশ প্রভাবিত গল্পনিচয়

পরিবেশ মানবজীবন গঠনে এক অবিসংবাদী অভিভাবকরূপে বিদ্যমান। পরিবেশে মানুষ গড়ে ওঠে। জন্ম সূত্রে যে গুণ নিয়ে শিশু ভূমিষ্ঠ হয়, অনুকূল পরিবেশ তাকে যথাযথ প্রকাশ ও প্রতিষ্ঠাতে সাহায্য করে, আবার বিরুদ্ধ পরিবেশ ধ্বংসের দিকে ঠেলে দেয়। তাই ব্যক্তিত্ব সৃষ্টিতে পরিবেশের অবদান অনস্বীকার্য। এলপোর্ট ব্যক্তিত্ব সম্পর্কে বলেছেন, **"Personality is the dynamic organisation within the individual of those psychological systems which determine his unique adjustments to his environment."** (২৭) মার্কস মানুষের জীবনে অর্থনৈতিক পরিবেশের গুরুত্ব আরোপ করেছেন। সুস্থ পরিবেশ মানুষের জীবন-ধারার পরিবর্তন ঘটায়। কোন অশিক্ষিত পরিবারের ছেলেকে যদি শিক্ষিত পরিবেশে নিয়ে এসে তাকে শিক্ষিত করার প্রচেষ্টা করা হয়, তাহলে সেই শিশুর বংশগতির অনেক প্রভাব পরিবর্তন হতে পারে। তারাশঙ্করের গল্পের জগৎ রাঢ়ের অশিক্ষিত ধূলিমলিন পল্লীর মানুষদের নিয়ে, যেখানে সমাজের গতি ও পরিবর্তন অত্যন্ত ধীর গতিতে হয়ে থাকে। শুষ্ক, রুক্ষ, কাঁকুরে মাটিতে ফসল আশানুরূপ হত না। উন্নত কৃষির জন্যে সরকার ও জমিদারগণের প্রচেষ্টার অভাব ছিল। ফলে অর্থনৈতিক দৈন্য ছিল প্রকট, সুষ্ঠু সমাজ জীবনও ভেঙ্গে গিয়েছিল। লেখকের বহু গল্পে এর ছাপ স্পষ্ট— যেগুলি পরিবেশ প্রভাবিত হয়ে চকিতে ঘটনার অসাধারণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। উল্লেখযোগ্য গল্পগুলির আলোচনা করা যেতে পারে—

শ্মশানবৈরাগ্য ঃ- অর্থের প্রতি চাহিদা বাড়তে বাড়তে একজন সাধারণ মানুষ অনুকূল পরিবেশ পেয়ে অমানুষ, অর্ধগৃধ্নু, পিশাচে পরিণত হয়। সামান্য অর্থের জন্যে দয়া, মায়া, কর্তব্য এমনকি চক্ষুলজ্জাকেও বিসর্জন দেন— এমনই এক চরিত্র মহিম বাঁড়ুজ্জের। বিধবা অসহায়া দিদির সংসারে দিনের পর দিন অন্নধ্বংস করেছে সে, অথচ তার বিপুল অর্থের সামান্য কাণাকড়িও দিদির সংসারে দান করে না। দরিদ্র দিদি এক মেয়েকে রেখে মারা গেলে সাময়িক ভাবে মহিমের চিত্ত-বৈকল্য ঘটেছে অর্থাৎ সে দিদির শ্রাদ্ধের জন্যে টাকা খরচ করেছে। কিন্তু এই উদাসীনতা কয়েকদিনের মধ্যেই দূর হয়েছে। শ্রাদ্ধের খরচের টাকা কটার জন্য হা-হুতাশ করেছে সে, আবার অসহায়া ভাগ্নীর শেষ সম্বল সোনাকটা হাতে পেয়ে গ্রাস করেছে।

কুলীনের মেয়ে ঃ- এই গল্পে জমিদার ধনদা মুখুজ্জে রেজিষ্টারী অফিসে কেরাণীর কাজ করতেন। তার সংসারের অবস্থা বেশ স্বচ্ছল। অফিসে বেতন ছাড়াও দৈনিক দু-তিন টাকা উপরি পাওনা ছিল। পনেরো টাকার মূল বেতনের সময় দু-তিন টাকা অতিরিক্ত পাওনা তা কম কথা নয়। উপরিপাওনা বা ঘুষ এক প্রকার চুরিরই নামান্তর। এই অসৎ প্রবৃত্তির জন্যে তাঁরই কন্যা বিধবা তরু প্রৌঢ় বয়সে পেটের জ্বালায় ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করে এবং গ্রামের গাঙ্গুলীবাড়িতে নিমন্ত্রণ খেতে গিয়ে সুযোগ পেয়ে সোনার তাগা ও এক ছড়া চেন চুরি করে। কিন্তু পরিবেশ তরুকে সৎ হতে শিক্ষা দেয়, তাই চুরির অপরাধ সে সহ্য করতে পারে নি বলেই হয়তো আত্মগ্লানিতে তরু বিষ খেয়ে মারা যায়।

চণ্ডীরায়ের সন্ন্যাস ঃ- চণ্ডীচরণ রায় মাতাল, সাতপুরুষধরে তাদের তান্ত্রিক বংশ। চণ্ডীচরণ সহজ, সরল, নিষ্ঠাবান, অকৃতদার। তার একমাত্র নয়নের মণি বিধবা ভাগ্নী। চণ্ডীচরণ মিশত যে পরিবেশে তা ভাল নয়। বিশেষ করে মদের দোকানদার, লোভী গিরীশ সাহা। সে সর্বদা চণ্ডীচরণকে মদ খাইয়ে রাখত কারণ তার লক্ষ্য ছিল চণ্ডী রায়ের জমিগুলোকে আত্মসাৎ করা। এই নোংরা জঘন্য পরিবেশে মিশেই চণ্ডীচরণ তার আদরের ভাগ্নীকে দান করা সমস্ত সম্পত্তি আদালতে মামলা করে কেড়ে নেয়। ভাগ্নী দুঃখে, ক্ষোভে ঘর ছাড়ে। বিরুদ্ধ পরিবেশ-ই তাদের সুখের সংসারে আগুন সৃষ্টি করে।

মরুর মায়া ঃ- বেদেরা যাযাবর, তারা পরের ছেলে চুরি করে নিজেদের সমাজে নিয়ে এসে মানুষ করে। ধীরে ধীরে জন্মসূত্রে উচ্চ বংশে জন্মানো কোন শিশু বেদেদের পরিবেশে থাকতে থাকতে সে বেদিয়া হয়ে যায়। ডাকু বর্তমানে

বেদেদের সর্দার কিন্তু একসময় সেও ছিল নদীয়া জেলার নওগাঁও জমিদার অবিনাশ চৌধুরীর ছেলে। আবার সেও একদিন বর্ধমান জেলার কালীপুর গ্রামের জগদীশ রায়ের পুত্রকে চুরি করে আনে এবং তার নাম দেয় ননকু। ননকু বড় হয়ে যখন নিজের পরিচয় জানতে পারে তখন সে পালিয়ে যায়, কিন্তু আবার ফিরে আসে বেদেদের সমাজে। জন্মসূত্রে উচ্চবংশে জাত হয়েও ননকু বেদেদের পরিবেশে থেকে বড় হয়েছে এবং সব ভুলেছে, তাই বাড়ী যেতে চেয়েও পারে নি। এই পরিবর্তনের জন্যে তার পরিবেশই দায়ী।

মতিলাল ঃ- অত্যন্ত সহজ ও সারল্যে পূর্ণ হয়েও বিকৃত বীভৎস আকৃতির জন্যে মতিলাল হাড়ি সভ্য সমাজের কাছে পেয়েছে আঘাত ও লাঞ্ছনা। অন্যের ছেলেমেয়েদের নিঃস্বার্থভাবে ভালবাসার অধিকারও সে পায়নি। তাই সে সংসারী হয়ে সন্তানের জন্যে চেষ্টা করেও শেষ পর্যন্ত সন্তানকামনা ত্যাগ করেছে। পরিবেশ যদি অনুকূল হত, যদি ভদ্ররূপী মানুষেরা মতিলালকে ভালো চোখে দেখতেন, তাহলে মতিলালের জীবনে এমন দুঃখ আসত না বা মতিলালের সন্তান হলে সে হয়তো সুখী হত। মতিলালের সন্তান সুন্দর হতেও পারত। এখানে বিরুদ্ধ পরিবেশ তার মানসিকতার পরিবর্তন ঘটিয়েছে।

মেলা ঃ- রূপোপজীবিনী কমলি যে কোন কারণেই হোক বাধ্য হয়েই এই হীনবৃত্তি গ্রহণ করেছিল। মনের দিক থেকে কোন দিনই এই বৃত্তিকে গ্রহণ করতে পারেনি, কিন্তু সুযোগ পায় নি বলেই সে পালাতে পারে নি। কিন্তু মেলায় হারিয়ে যাওয়া মণিকে সেখানকার লোক (মাসি) বিক্রি করতে চাইলে, মণিকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে কমলি বস্তি ছেড়েছে। সে ভবিষ্যতের চিন্তা করেনি, সমাজে কোথায় দাঁড়াবে তার চিন্তাও করে নি, শুধু এই বিষাক্ত পরিবেশ থেকে মেয়েটিকে বাঁচানোর সুতীব্র আকাঙ্ক্ষায় মুহূর্তে সব বিস্মৃত হয়েছে। অবশ্য সেই সঙ্গে তার মাতৃত্বের এক গভীর উন্মাদনাও ক্রিয়াশীল ছিল।

অগ্রদানী ঃ- পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তীর জীবন এমন হীন, জঘন্য হয়ে উঠত না যদি দরিদ্র না হতো ও লোভনীয় পরিবেশ না পেত। একদিকে সন্তান ও পরিবারের জন্যে আহারের চিন্তা, অন্যদিকে নিজের অসংযত লোভ তাকে যেমন দিশাহারা করেছে, অন্যদিকে জমিদার শ্যামাদাস বাবুর দেওয়া একের পর এক লোভনীয় প্রস্তাবদান— এই দ্বিবিধ সত্তায় পূর্ণচন্দ্রের এই পূর্ণত্ব ঘটেছে। দশবিঘা জমির সঙ্গে সিংহবাহিনীর নিত্য এক থালা প্রসাদের লোভেই পূর্ণ চক্রবর্তী নিজের ছেলেকে পর্যন্ত সূতিকাগার থেকে দিয়ে আসতে পেরেছে। পঁচিশ বিঘা জমির লোভে দরিদ্র ব্রাহ্মণ সহজেই শ্যামাদাসবাবুর স্ত্রীর পিন্ড গ্রহণ করেছে। দশবিঘা জমি পুনরায় পাওয়ার পরিবর্তে পূর্ণ চক্রবর্তী নিজপুত্রের (শ্যামাদাস বাবুকে দেওয়া) শ্রদ্ধার পিন্ড গ্রহণ করেছে। চক্রবর্তী লোভী ঠিকই, তথাপি তার এই নির্মম চরিত্র সৃষ্টির জন্য শ্যামাদাসবাবুর লোভনীয় সম্পত্তি, ভোগ, দান-সামগ্রী প্রদানই সর্বাংশে দায়ী।

নুটু মোক্তারের সওয়াল ঃ- সত্যবাদী ও মহাপন্ডিতের বংশধর নুটু বিহারী— পেশায় শিক্ষক, দরিদ্র তথাপি আদর্শ মানুষ হবার স্বপ্নে তিনি বিভোর ছিলেন। ধনী জমিদার-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ রক্ষা করতে গিয়ে তাঁর স্ত্রী অপমানিতা হন। অপমানের প্রতিশোধ নিতে সব আদর্শ জলাঞ্জলি দিয়ে মোক্তারি ও ওকালতি পাশ করেন। আদালতে কেসে জমিদার অন্যায়ভাবে নুটুর জমির ভাগচাষী মহাভারতের উপর অত্যাচারের জন্যে হেরে যান। নুটুর খ্যাতি ও প্রসার বাড়তে থাকে— বিশাল অট্টালিকা ও প্রচুর অর্থের মালিকও হন। জমিদার যদি নুটুর স্ত্রীকে অপমান না করতেন কিংবা নির্দোষ মহাভারতের উপর এই অত্যাচার না করতেন তাহলে সমাজ একজন সৎ আদর্শবাদী, সার্থক শিক্ষক হিসেবে নুটুকে পেত। তিক্ত পরিবেশ ও বিরুদ্ধ পরিস্থিতি নুটুর মানসিক পরিবর্তনের জন্যে দায়ী।

না ঃ- প্রতিশোধের আগুনে জ্বলতে যেমন নুটুর দেখি, তেমনি আবার আদালতের কাঠগড়ায় স্বামী হত্যাকারী বলশালী, দাম্ভিক, যুবকের পরিবর্তে এক শুভ্রকেশ, শীর্ণতনু, ন্যুব্জদেহ, বিহ্বলদৃষ্টি, করজোড়ে দন্ডায়মান যুবককে দেখে দীর্ঘ আট বছর কৃচ্ছ্র সাধন করেও তাকে মুক্তি দিয়েছেন ব্রজরাণী। হত্যাকারী অনন্ত আর বিচার প্রার্থী অনন্তের মধ্যে দুস্তর পার্থক্য দেখেই ব্রজরাণীর প্রতিশোধের আগুণ নিভে গিয়ে নেত্র থেকে ক্ষমাসুন্দর শান্তপ্রবাহ ধারা বর্ষিত হয়েছে। দীর্ঘ আট বছর স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে যে পরিবেশে প্রতিজ্ঞা পালন করেছিলেন, সে পরিবেশ দীর্ঘ আট বছরের জীবনে পরিবর্তন হয়ে গেছে, পরিবর্তে তাঁর চিত্তে নিরাসক্ত ও বৈরাগ্যের জন্ম হয়েছে। সেই জন্যেই বোধ হয় ব্রজরাণীর চরিত্রে এই অভাবনীয় পরিবর্তন।

জলসাঘর ঃ- এই গল্পে উদীয়মান ধনী মহিম গাঙ্গুলী পরিবেশের গুণেই এমন উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করেছে। গাঙ্গুলীবংশ চিরদিন রায় দপ্তরের এলাকায় মহাজনি করেছে। রায় কর্তাদের হুজুর বলেছে। কিন্তু ইংরেজদের দয়ায় অর্থের পরিমাণ ক্রমপুঞ্জহারে বেড়েছে, ফলে সে সাহেব, বাবুদের কাছে সম্মান পেয়েছে, পায়নি কেবল গ্রামের সাধারণ প্রজাদের কাছে। কারণ ঐ রায়বাড়ি। প্রজাদের কাছে দামী মোটর অপেক্ষা রায়বাড়ী বৃদ্ধ হস্তিনীর খাতির অনেক বেশী। অর্থের প্রাচুর্য

মহিমকে বংশ পরম্পরার হুজুর সম্বোধন ভোলাতে চেয়েছে; সে নিজেকেই হুজুর বলে সকলের কাছে জাহির করতে চেয়েছে এবং পদে পদে অর্থের প্রতিযোগিতায় মহিম বিশ্বম্ভর রায়কে হেনস্ত করেছে। এখানে বংশগতি নয়, অর্থনৈতিক পরিবেশই দায়ী।

কবি ঃ- বীরভূমের আদি অপরাধপ্রবণ জাতিগুলোর মধ্যে শ্রেষ্ঠ হল হাড়ি— যেখানে বংশপরম্পরায় চুরি, মদ্যপান, নরহত্যা, ব্যাভিচারী জীবনযাপন, সংস্কারহীন সমাজই প্রতিফলিত। সেই বংশে জন্মগ্রহণ করেও নিতাই হাড়ি পিতৃপিতামহের রক্তের সামান্যতম অংশও গ্রহণ করেনি। সে চুরি তো দূরের কথা, মিথ্যা কথা বলা বা কোন নেশা পর্যন্তও করে না। বেশীদূর লেখা পড়াও করেনি অথচ সৎ, সত্যবাদী। মাকে চোর বলার অপরাধে মামার কাছ থেকে অপমানিত হয়ে ঘর ছাড়ে এবং গ্রামের স্টেশনে কুলি-ব্যারাকের মধ্যে বাসা করে থাকে। মাঝে মাঝে কুলিগিরি করে শেষে কবিয়াল হয়ে যায়। দেশে দশের কাছে সম্মান, ভালবাসা, অর্থ, পুরস্কারও পায়। নিতাইয়ের বংশ এত জঘন্য হীন হওয়া সত্ত্বেও নিতাই কেমন করে এত ভাল হল? মনে হয় ছোটবেলা থেকে ওকে লেখাপড়া শেখানো হয়েছিল এবং বাড়ী ছেড়ে স্টেশনে চলে আসে। বিভিন্ন খারাপ ভাল মানুষের সঙ্গে মিশেছে; হঠাৎ কবিগান গেয়ে সুনাম পেয়ে যায়। জীবনের অনুকূল পরিবেশই তাকে ও তার স্বভাবকে পরিবর্তন করে দিয়েছিল। এই পরিবেশকে আমরা মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশ বলতে পারি।

চরহাটির স্টেশন মাষ্টার ঃ- এই গল্পটিকেও মনস্তাত্ত্বিক পরিবেশের ফসল হিসেবে বলা যেতে পারে। ব্রাহ্মণ সন্তান স্টেশনে টিকিট কালেক্টর। বৃত্তিতে তিনি ভৃত্যেরও অধম। কোম্পানীর বশংবদ ভৃত্য বলে তিনি এই বৃত্তিকেই গর্ব করেন। ঘর, বাড়ি, সব ভুলেছেন এখানেই তিনি সংসার পেতেছেন। কোম্পানী স্টেশন উঠিয়ে দিতে গেলে মাষ্টার মশাই অনুনয় বিনয় করে স্টেশনের পাশেই একটি জায়গায় বিনা খাজনায় কয়লার ব্যবসা করার অনুমতি লাভ করেন। কিন্তু মাষ্টারের মর্যাদা থাকবে না, তাই নির্লজ্জের মত সাহেবকে বলেছেন যে বিনা বেতনে যদি তাঁকে টিকিট কালেক্টরের কাজটা দেওয়া হয় তো ভাল হয়। কোম্পানী তাঁর প্রস্তাব মঞ্জুর করে। স্টেশনে কাজ করতে করতে ইনি নিজেকে বিলিয়ে দিয়েছিলেন, নিজের মনুষ্যত্ব, বিবেক ইত্যাদি সব কিছু।

জটায়ু ঃ- শিবু কর্মকারের আধপাগলা জোয়ান ছেলে জটে। বাবার সাথে কামারশালায় লোহার কাজ করতো; কিন্তু বিশ বাইশ বছর বয়সে গ্রামে "সীতাহরণ" পালা দেখে তার মানসিকতার পরিবর্তন হয়। সীতাহরণকে সত্য বলেই সে ধরে নেয়। অভিনয়ে জটায়ু যে সেজেছিল সেই উমেশকে জটে প্রণাম করেছিল, কারণ জটায়ুর আত্মদান তাকে মুগ্ধ করেছিল। পরদিন উমেশকে জীবিত দেখে জটে তাকে "কাপুরুষ" বলে চিৎকার করে। এরপর নাটকের মূলকর্তা শিবনাথের কাছে যায় "সীতাহরণ" পালায় জটায়ু সাজবার জন্যে। এইভাবে যাতায়াত করলেও শিবনাথ জটেকে অভিনয়ের সুযোগ দেন নি। একদিন রাত্রে গ্রামে সাধুবেশী নেপাল গুন্ডা যখন শিবনাথের স্ত্রী কল্যাণীকে চুরি করে নিয়ে যায়, তখন অন্ধকার পথে নেপাল গুন্ডাকে জটে আক্রমণ করে কল্যাণীকে উদ্ধার করলেও সে ও নেপাল গুন্ডা উভয়েই মারা যায়। সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান মানুষের মানসিকতা ও নিজস্ব পরিবেশকে পরিবর্তন করে দিতে পারে। নাটকটি দেখার পর থেকেই জটের মানসিকতার পরিবর্তন ঘটে যায়। রামকৃষ্ণের সেই অমোঘ বাণী— "থিয়েটার নোকশিক্ষের হয়" কথাটি জটের জীবনে হুবহু মিলে গেছে। সাংস্কৃতিক পরিবেশ জটের জীবনকে মহা মহিম করে তুলেছে।

পাদটীকা

1.	Mac Iver & page	:	Society	P - 95
2.	Woodworth & Marquis	:	Psychology	P-154
3.	Mac Iver & Page	:	Society	P - 97
4.	অনাদিকুমার মহাপাত্র	:	বিষয় সমাজতত্ত্ব	পৃ. ২৩৯
5.	K. Pearson	:	Biometrika, Vol-3	P-156
6.	Krech & Crutchfield	:	Elements of Psychology	P-563
7.	D. Mitra, J. Guha,S.K.Chowdhury	:	Studies in Botany -Vol -2	P-899
8.	Thrope	:	Psychological Foundations of Personality	P-16

9.	প্রমোদবন্ধু সেনগুপ্ত	:	মনোবিদ্যা	পৃ. ৩৫১
10.	Woodworth & Marquis	:	Psychology	P-164
11.	G. Wilson Shaffer	:	The Biological Basis of Pediatric practice	P.-53
12.	Mac Iver & page	:	Society : An Introductory Analysis p-73	
13.	ibid	:		P-74
14.	ibid	:		P-78
16.	অনাদিকুমার মহাপাত্র	:	বিষয় সমাজতত্ত্ব	পৃ. ২২০
17.	ডঃ প্রীতিভূষণ চট্টোপাধ্যায়	:	মনোবিদ্যা (অষ্টম অধ্যায়)	পৃ.৩৫
18.	Mac Iver & page	:	Society	P-95
19.	Ibid	:		P-74
20.	Ibid	:		P-96
21.	খগেন্দ্র নাথ সেন	:	সমাজবিজ্ঞানের ভূমিকা	পৃ. ২৪৬
22.	যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত	:	বাংলার ডাকাত (অখন্ড সং), ভূমিকা	পৃ. ১
23.	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	:	রচনাবলী ১০ম খন্ড	পৃ. ৪০৩
24.	প্রাগুক্ত	:		পৃ. ৪০৩
25.	জগদীশ ভট্টাচার্য	:	তারাশঙ্করের গল্প গুচ্ছ (২য় খন্ড)	পৃ. ২১৪
26.	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়	:	আমার সাহিত্য জীবন (১ম খন্ড)	পৃ. ৮৮
27.	G. W. Allport	:	Personality : A Psychological Interpretation	P-48

* * * * * * * * * * *